Vol. 54 | No. 3 | 2017

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাদল সরকারের নাটক : প্রসঙ্গ অ্যাবসার্ডিটি

Volume	54
Issue	3
Year	2017
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মোহসিনা হোসাইন
Published online	June 1, 2017
DOI	10.62328/sp.v54i3.10
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v54i3.10
Pages	২২৯-২৫১
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

বাদল সরকারের নাটক : প্রসঙ্গ অ্যাবসার্ডিটি

মোহসিনা হোসাইন*

সারসংক্ষেপ : বাংলা নাটকের ধারায় বাদল সরকারের অবস্থান ও অবদান স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত। বিষয় ও প্রকরণগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে বাংলা নাট্যাঙ্গনে তিনি সম্পাদন করেছেন অভিনবত্ব। নবপথ-অন্বেষী বাদল সরকারের নাট্য কলা-কৌশলের অসাধারণ সংযোজন অ্যাবসার্ড থিয়েটার। সমকালীন ভারতীয় আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক জটিল ঘূর্ণাবর্তে মানবিক সংকটের রূপায়ণকল্পে তিনি পাশ্চাত্য অ্যাবসার্ড নাট্যতত্ত্বের প্রয়োগ করেন। প্রকৃতপক্ষে বাংলা নাট্যশিল্পে বাদল সরকার অ্যাবসার্ডিটির প্রয়োগ ও পরীক্ষায় কী অবদান রেখেছেন তা উপস্থাপনই বর্তমান প্রবন্ধের অন্বিষ্ট।

বিংশ শতাব্দীতে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিবর্তমান সময়প্রবাহে ইউরোপের সাহিত্যধারায় 'অ্যাবসার্ড'[১] শিল্পরীতির স্মরণীয় উদ্ভব ঘটে। হাঙ্গেরীয় সমালোচক মার্টিন এসলিন (১৯১৮-২০০২) তাঁর *দ্য থিয়েটার অব দ্য অ্যাবসার্ড* (১৯৬১)[২] গ্রন্থে সর্বপ্রথম 'অ্যাবসার্ড' শব্দটি ব্যবহার করেন। সাহিত্যের অন্যান্য মাধ্যমের তুলনায় নাট্যসাহিত্যে এর ব্যবহার সমধিক। পাশ্চাত্য অ্যাবসার্ড নাট্যতত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলা নাটকে অ্যাবসার্ডিজম গৃহীত হলেও বাংলা ভাষার নাট্যকাররা ইউরোপীয় অ্যাবসার্ড নাট্যরীতির ছাঁচকে অবিকল গ্রহণ করেননি; বরং দেশজ উপায়-উপকরণের সঙ্গে সমীকৃত করে বাঙালি নাট্যকাররা এর মধ্যে লক্ষণীয় বৈচিত্র্য সম্পাদন করেছেন। বাংলা অ্যাবসার্ড নাটকের পটভূমিতে প্রত্যক্ষভাবে বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতার প্রভাব না থাকলেও ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ, উদ্বাস্তু-জীবন, বেকারত্ব, মূল্যবোধের অবক্ষয়, রাজনৈতিক অস্থিরতা প্রভৃতি আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট ছিল সক্রিয়। বাংলা সাহিত্যে অ্যাবসার্ড নাটক রচনায় যাঁরা[৩] পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন বাদল সরকার (১৯২৫-২০১১)। তাঁর *এবং ইন্দ্রজিৎ* (১৯৬০), *বাকী ইতিহাস* (১৯৬৫) এবং *পাগলাঘোড়া* (১৯৬৭) কালোত্তীর্ণ অ্যাবসার্ড নাটকের নিদর্শন। এ ছাড়াও *সারারাত্তির* (১৯৬৩), *বাঘ*

*প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়।

(১৯৬৫), *প্রলাপ* (১৯৬৬), *যদি আর একবার* (১৯৬৬), *ত্রিংশ শতাব্দী* (১৯৬৬), *শেষ নেই* (১৯৭০) প্রভৃতি নাটকে তিনি পাশ্চাত্য অ্যাবসার্ডীয় নাট্যরীতির সফল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন।

নাট্যকার, অভিনেতা, নির্দেশক ও নাট্যসংগঠক বাদল সরকারের জন্ম উত্তর কলকাতার বিডন স্ট্রিটে। বাবা মহেন্দ্রলাল সরকার ছিলেন স্কটিশচার্চ কলেজের প্রথম ভারতীয় অধ্যক্ষ। পেশায় প্রকৌশলী হলেও নাটকের প্রতি বাদল সরকারের ছিল প্রবল আগ্রহ। ছেলেবেলায় মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনতেন রেডিওতে প্রচারিত নাটক। নাটকের সঙ্গে যোগসূত্র পাড়ার নাট্যদলে অভিনয় করা থেকেই। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ছাত্রাবস্থায় মলিয়ের (১৬২২-১৬৭৩), জর্জ বার্নাডশ (১৮৫৬-১৯৫০), ইউজিন ওনিল (১৮৮৮-১৯৫৩) প্রমুখের নাটকের সঙ্গে পরিচয় এবং কলেজের নাট্যদলে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে নাট্যজগতে তাঁর প্রবেশ। পড়াশোনার পাশাপাশি মার্কসবাদী রাজনীতিতে উৎসাহী হয়ে সক্রিয় হন কমিউনিস্ট পার্টির কর্মকাণ্ডে। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, নাইজেরিয়ায় অবস্থানসূত্রে তাঁর নাট্যিক অভিজ্ঞতা ও নাট্যচর্চা হয়ে উঠেছে সমৃদ্ধ। কলকাতার স্বনামখ্যাত নাট্যদল *শতাব্দীর* প্রতিষ্ঠাতা তিনি; গঠন করেছিলেন *চক্রগোষ্ঠী* নামে একটি সাহিত্যসংঘও। বাংলা নাট্যমঞ্চের ইতিহাসে বাদল সরকারই প্রথম প্রসেনিয়াম থিয়েটারের ঘেরাটোপ ভেঙে থার্ড থিয়েটার বা মুক্তমঞ্চের প্রবর্তন করেন। তবে তাঁর অ্যাবসার্ডধর্মী নাটকের প্রায় সবগুলোই প্রসেনিয়াম থিয়েটারে মঞ্চায়িত।

১৯৬০-এর দশকে বাংলা নাট্যজগতে বাদল সরকারের দীপ্র আবির্ভাব। তাঁর মৌলিক ও রূপান্তরিত নাটকের সংখ্যা আটান্নটি। আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক সংঘাত-সংঘর্ষ, আন্দোলন-প্রতি আন্দোলনের এক তরঙ্গসংকুল সময়পরিবেশে তিনি তাঁর নাটকগুলি রচনা করেছেন এবং অভিনয় করেছেন। তাঁর অ্যাবসার্ডধর্মী নাট্যপ্রয়াস বাংলা নাট্যধারায় উন্মোচন করেছে নবতর দিগন্ত। ভূমিকাংশে শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন– 'কেবল বাংলা নাট্যের গড়ন-সমস্যাই ব্যস্ত করেনি বাদল সরকারকে; তৎসহ যে মনস্তাত্ত্বিক আবহে কোন গড়নকে 'স্বাভাবিক' বা 'সংগত' বোধ হয় মানুষের, তা নিয়েও ঢের কাটাছেঁড়া করেছিলেন তিনি...।' (বাদল, ১৪১৬খ : নয়)

অ্যাবসার্ড নাট্যাঙ্গিক হেঁয়ালিপূর্ণ, উদ্দেশ্যহীন, কার্যকারণশৃঙ্খলাবিন্মিত; এককথায় প্রথাগত ধারার বিপরীত। তবে অ্যাবসার্ড নাটক প্রকরণহীন নয়, বরং একটি বিশেষ শিল্পশৈলী, যা প্রচলিত ফর্ম ভেঙে দেয়। দুঃসহ নৈঃসঙ্গ, প্রবল নৈরাশ্য ও বিপন্ন জীবনজিজ্ঞাসায় মানবঅস্তিত্বের যে দর্শন, সেখানেই প্রতিফলিত হয় অ্যাবসার্ডীয় উপাদান ও আবহ। 'অসংবদ্ধ আখ্যান, নাটকীয় ঐক্য ও পরম্পরা-বর্জিত শিথিল গঠন-বিন্যাস, দ্বন্দ্ব-সংকট-টানাপড়েনহীন নাটকীয় গতি, ভিত্তিহীন অতিকাল্পনিক প্রতীকী চরিত্র, ভাষার ইচ্ছাকৃত অনবধানতা ও অযৌক্তিকতা প্রভৃতি অ্যাবসার্ড নাটকের শৈলী ও স্বাতন্ত্র্য।' (তারানা, ২০১৩ : ১১৬)

অ্যাবসার্ডীয় রীতিতে বাদল সরকার লিখেছেন বিংশ শতাব্দীর এক অসাধারণ দেয়ালভাঙা নাটক *এবং ইন্দ্রজিৎ*[৪]। নাট্যসমালোচক পবিত্র সরকারের অভিমত –

> ...এবং ইন্দ্রজিৎ ভারতীয় নাট্যসাহিত্যে একটি পথপ্রদর্শনকারী সৃষ্টি। বক্তব্য ও রূপকলা – দুদিক থেকেই অভিনবত্ব নিয়ে আসা এ নাটক বাঙালি বা ভারতীয় মধ্যবিত্তের জীবনযাপনের শারীরিক ও মানসিক সংকীর্ণতাকে এক সম্পূর্ণ নতুন নাট্যভাষায় প্রকাশ করেছে। (পবিত্র, ২০০৮ : ১৪৯)

নাটকটিতে প্রকৃত অর্থে কোনো সুসংবদ্ধ আখ্যান নেই, নেই ঘটনার বিস্তার, দ্বন্দ্ব, বিবর্তন বা পরিণতি। কেবল চরিত্রগুলির তৈরি করা পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে সাধারণ মানুষের জীবনের গতানুগতিকতা। অমল, বিমল বা কমল আলাদা চরিত্র হলেও জীবনপ্রবাহের অভিন্ন গণ্ডিতে সবাই চক্রাকারে ঘূর্ণমান। জৈবিক বাস্তবতায় সামান্য তারতম্য থাকলেও মানসিকতায় তারা স্বাতন্ত্র্যবোধহীন। তবে ইন্দ্রজিৎ জীবন আবর্তনের প্রতিটি অবস্থান থেকে নিজের মতো করে জীবনকে দেখে। তার দৃষ্টিভঙ্গি ও দর্শন সাধারণদের থেকে আলাদা, বৃহৎ ও ব্যাপ্ত। অ্যাবসার্ড নাটকের অন্যতম আলোচ্য বিষয় মানুষের অর্থহীন সময় পরিক্রমণ, সংঘটনহীন জীবনের সরল কক্ষপথ আবর্তন ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে একঘেয়ে জীবনের পরিসমাপ্তি। আধুনিক মানুষের সংকট ও সংবেদনাকে ধারণ করতে সক্ষম বলেই অ্যাবসার্ড নাটকের সমস্ত অসংলগ্নতা, অসম্ভাব্যতা ও অবাস্তবতা জনপ্রিয় শিল্পরূপে গ্রহণযোগ্য। *এবং ইন্দ্রজিৎ* নাটকের বক্তব্য ও শৈলী – উভয়ক্ষেত্রেই অ্যাবসার্ডীয় নাট্যতত্ত্বের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন বাদল সরকার। মধ্যবিত্ত বৃত্তাবদ্ধ জীবনের প্রেক্ষাপটে অমল-বিমল-কমল এমনকি ইন্দ্রজিৎও উদ্দেশ্যহীন, অর্থহীন, সংকটাপন্ন, চক্রাকার জীবনপ্রবাহ দ্বারা আবর্তিত। তারা জীবনের চৌহদ্দি, সীমাবদ্ধতার গণ্ডি পেরিয়ে অনন্ত পথে যাত্রা করতে পারে না; পিছুটান তাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধে। তারা অভ্যস্ত হয়ে যায় গড়পড়তা জীবনে–

> ইন্দ্রজিৎ : ও হ্যাঁ। আমার বৌ সংসার দেখে। আমি চাকরি করি। আমার বৌ সিনেমায় যায়। আমি সঙ্গে যাই। আমার বৌ বাপের বাড়ি যায়। আমি হোটেলে খাই। আমার বৌ ফিরে আসে। আমি বাজার করি। (বাদল, ১৪১৬ক : ৩০৭)

নাট্যকার সময়কে বিচিত্রভাবে ধরতে চেয়েছেন; জীবনের পর্যায়গুলো ধাপে ধাপে অতিক্রম করার বিষয়টি তুলে ধরেছেন প্রতীকী দৃশ্যের মাধ্যমে। আধুনিক মানুষ তার জীবন জটিলতার বহমান স্রোতে গা ভাসিয়ে বাস্তবতার সঙ্গে আপস করলেও ইন্দ্রজিতের মতো কেউ কেউ গতানুগতিকতার ছাঁচে আবদ্ধ না থেকে ভিন্ন পথে হাঁটতে চায়। সমস্ত নিয়মের ছক ও বৃত্তাবদ্ধতাকে ভেঙে অমসৃণ পথে নিজের ছায়া পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে চায়। জীবনের ইঁদুর দৌড় দৌড়াতে গিয়ে থেমে যায় ইন্দ্রজিৎ; অমল-বিমল-কমলের মতো একঘেয়ে আবর্তনে ঝাঁকের কই হতে পারে না। ইন্দ্রজিৎ পা বাড়ায় বৃত্তের বাইরে –

ইন্দ্রজিৎ : ভূগোলের বাইরে একটা পৃথিবী আছে। বাইরের পৃথিবী। এখানে নয়। অন্য কোথাও। দূরে কোথাও। বাইরে কোথাও।

লেখক : ক্রিকেট-সিনেমা-ফিজিক্স-রাজনীতি-সাহিত্যের বাইরে?

ইন্দ্রজিৎ : ঠিক বলেছিস! (বাদল, ১৪১৬ক : ২৬৯)

এবং ইন্দ্রজিৎ নাটকে নাট্যকার বাদল সরকার সময়ের পর্যবেক্ষক ও নাট্যতাত্ত্বিকরূপে উপস্থিত থেকে প্রথাবদ্ধ ব্যাকরণকে ভেঙে একটি বিশেষ প্রকরণের প্রয়োগ করেছেন। এই নাটকের কোনো প্লট নেই, থিম তুচ্ছ জীবনের কণিকা, তবে কাহিনি গ্রন্থনে বিদ্যমান স্বতঃস্ফূর্ত সাবলীলতা।

লেখক : প্রাণের উদ্ধত অধিকারে।

অনন্ত ঘোষণা রাখি কণিকার মুহূর্তপ্রচারে।

এইসব কণিকা! এদের মুহূর্ত-প্রচারের ইতিহাস নিয়ে আমার নাটক। অমল-বিমল-কমল। এবং ইন্দ্রজিৎ। (বাদল, ১৪১৬ ক : ২৯৮)

'লেখক' চরিত্রের সংলাপের মাধ্যমে স্বয়ং নাট্যকার বাদল সরকার অ্যাবসার্ড নাটকের গঠনকৌশলের ধারণা দিচ্ছেন। 'লেখক : এ নাটকের আরম্ভ আর শেষে বিশেষ তফাৎ নেই। নাটকটা বৃত্তাকার।' (বাদল, ১৪১৬ক : ৩০৫) এ নাটকে গতানুগতিক নাট্যরীতিকে অস্বীকার করে মঞ্চে দর্শকের দিকে পিঠ ফেরানোর দৃশ্য চোখে পড়ে এবং ইন্টারভিউ দৃশ্যে কথোপকথনের পরিবর্তে দেখা যায় অপেক্ষারতদের সংলাপ।

এবং ইন্দ্রজিৎ নাটকের চরিত্রগুলো স্থিতিশীল নয়, চলমান ও স্থিতিস্থাপক; জীবনের সিঁড়িকে উপস্থাপন করতে নাট্যকার ধাপে ধাপে একজনের পর আরেকজনকে ব্যবহার করেছেন। ফলে পরিমিত দৃশ্যের অবতারণায় উঠে এসেছে সমগ্রতা। চরিত্র পরিকল্পনায় টাইপধর্মিতা আরোপিত হলেও একটি চরিত্র হয়ে উঠেছে অনেকগুলো চরিত্রের আধার। মানসী কখনও তাই ইন্দ্রজিতের প্রেমিকা কিংবা স্ত্রী আবার সে-ই অমল-বিমল-কমলের স্ত্রী অথবা অন্য কোনো নারী। একই ব্যক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রে চিত্রায়নের মধ্য দিয়ে তিনি চরিত্রের স্বাতন্ত্র্যহীনতা প্রকাশ করেছেন। নিরুদ্দিষ্ট সত্তার মাঝেই চরিত্রগুলোর অস্তিত্ব ক্রিয়াশীল থাকায় তাদের জগৎ নিপতিত হয় শূন্যতায়।

বস্তুত, জীবনের সুর ও সঙ্গতি থেকে বিচ্ছিন্নতাই অ্যাবসার্ড নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য। মানুষের মানস বিচ্ছিন্নতা, তার অসঙ্গতি এবং জীবনের ভবিষ্যৎ অর্থহীনতা অ্যাবসার্ড নাট্যকার তুলে আনতে চান তাঁর সৃষ্টিতে। প্রতিকূল পরিবেশের চাপে বিপর্যস্ত মানুষের বাইরের বাস্তবতাকে ভেঙে দিয়ে তার অসহায়তা, তার বৈনাশিক ভাবনা উপস্থাপনই অ্যাবসার্ড নাটকের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য।' (বিশ্বজিৎ, ২০১৪ : ১৬৬)

বিচিত্র অ্যাবসার্ডীয় উপাদানের সমন্বয়ে নির্মিত হয়েছে *এবং ইন্দ্রজিৎ* নাটকের সংলাপ। ক্রস ডায়ালগের মাধ্যমে জীবনের অর্থহীনতা, বৃত্তাবদ্ধতা ইত্যাদি প্রকাশিত

হয়েছে। ইঙ্গিতধর্মী গুচ্ছ শব্দের আপাত অর্থহীনতার অন্তরালে অভিব্যক্ত হয়েছে গভীর অর্থময়তা –

অমল : ধনতন্ত্র, রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র–

বিমল : সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিবাদ, মার্কসবাদ–

কমল : অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি–

অমল : কোটেশন, টেন্ডার, স্টেটমেন্ট–

বিমল : রিপোর্ট, মিনিট্স, বাজেট–

কমল : মিটিং, কমিটি, কনফারেন্স– (বাদল, ১৪১৬ ক : ৩০৬)

সাধারণ মানুষের বৃত্তাবদ্ধ জীবন নির্দিষ্ট গণ্ডির বাইরে ভাবতে পারে না, তাদের জীবনের তাৎপর্যহীনতা প্রকাশিত হয়েছে এসব গুচ্ছশব্দে। নাট্যকার প্রথাবদ্ধ নাটকের আঙ্গিক এবং সংলাপধর্মিতা বর্জন করেছেন। সংখ্যাবাচক শব্দের ব্যবহারে প্রকাশ করেছেন জীবনের একঘেয়েমি ও ঘূর্ণায়মানতা–

এক–দুই–তিন–

এক–দুই–তিন–দুই–এক–দুই–তিন–

এক–দুই–তিন–দুই–এক–দুই–তিন–

চার–পাঁচ-ছয় (বাদল, ১৪১৬ ক : ২৭০)

এবং ইন্দ্রজিৎ নাটকে হেয়ালিধর্মী গদ্য সংলাপ আছে, আবার কৌতূহলোদ্দীপক, ইঙ্গিতধর্মী কাব্যিক সংলাপের মাধ্যমে নাট্যকার অ্যাবসার্ডীয় দর্শন উপস্থাপন করেছেন–

আমি বিভক্ত, আমি অণুখণ্ডিত,

গুঁড়ো দিয়ে গাঁথা জটিল ঐকতান।

বুড়ো শতাব্দী আজো পেতে আছে কান,

চূর্ণ পৃথিবী এখনো অপরাজিত! (বাদল, ১৪১৬ ক : ২৮৫)

আলবেয়ার ক্যাম্যুর (১৯১৩-১৯৬০) *দ্য মিথ অব সিসিফাসে*[৫] (১৯৪২) দেবরাজ জিউসের বিরুদ্ধে সিসিফাস যেমন বিদ্রোহ করেছিল; অনবরত পাথর ঠেলে পাহাড়চূড়ায় তোলাকেই জীবনের নিয়তি বলে মেনে নিয়েছিল, ইন্দ্রজিৎও তেমনি স্বতন্ত্রভাবে বাঁচতে প্রবল সংবেদনশীলতায় অনবরত আত্মব্যবচ্ছেদ করেছে। 'লেখক : আমরাও অভিশপ্ত সিসিফাসের প্রেতাত্মা। আমরাও জানি ও পাথর পড়ে যাবে। যখন ঠেলে ঠেলে তুলছি তখনই জানি এ ঠেলার কোন মানে নেই।' (বাদল, ১৪১৬ ক : ৩১১) 'ইন্দ্রজিৎ' নামেই নিহিত আছে দেবতা ইন্দ্রকে জয় করেছে সে। ইন্দ্রজিৎ চরিত্রের ক্রমবিবর্তন ও রূপান্তর ঘটেছে; সে জীবনের সামগ্রিক বিপর্যয় থেকে মুক্তি

পেয়ে 'বিপন্ন বিস্ময়'[৬] নিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করেছিল, পারেনি। সাধ-সাধ্য-সক্ষমতা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে প্রাপ্তির পর্যায়ক্রমিক দূরত্বে মানুষ ক্রমাগত হতাশ হয়। জীবনের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির অসম সমীকরণে কখনও স্বপ্ন ধ্বংস হয়ে যায়, কখনওবা স্বপ্নটা শুরুই করতে পারে না।

ইন্দ্রজিৎ : না মানসী। আলো ঝলসালো না। আকাশে জ্বালা রইলো না। আমি দিগন্ত ছিঁড়ে উঠতেই পারলাম না ।

মানসী : কেন?

ইন্দ্রজিৎ : আমার ক্ষমতা নেই। কোনো দিন ছিল না। শুধু ক্ষমতার স্বপ্ন দেখতাম। আমি সাধারণ। স্বীকার করতে যতোদিন পারিনি – স্বপ্ন ছিল। আজ স্বীকার করি। (বাদল, ১৪১৬ ক : ৩১০)

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আপস করার প্রবণতা বাড়ে; নিয়মের বাইরে গিয়ে সুখ আর আনন্দকে গ্রহণ করতে ভয় পায়, পরিচয় আড়াল করে খোঁজে শান্তি আর স্বস্তি। স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণায় ইন্দ্রজিৎ বিভিন্ন মুহূর্তে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছে; জীবন থেকে, ঝাঁকের কই থেকে, এমনকি শেষ পর্যন্ত নিজের নাম থেকেও।

চতুর্থ দর্শক : ইন্দ্রজিৎ রায়

লেখক : তবে কেন নির্মল বলেছিলেন?

ইন্দ্রজিৎ : ভয়ে।

লেখক : কিসের ভয়ে?

ইন্দ্রজিৎ : অশান্তির। নিয়মের বাইরে গেলে অশান্তি। (বাদল, ১৪১৬ ক : ২৬৪)

এবং ইন্দ্রজিৎ নাটকে পথের অনুষঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে জীবনের চলমানতা। জীবন যতই নির্মম ও সংগ্রামবহুল হোক পথ চলতেই হবে – ক্যাম্যুর সিসিফাসের মূল কথাই এখানে ব্যক্ত। 'মানসী : পথ যখন, তখন হাঁটতেই হবে!' (বাদল, ১৪১৬ক : ৩০৮) কোথায় পৌঁছাবে, কেন যাচ্ছে তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল যেতে হবে, পথ চলতে হবে। বেঁচে থাকতে হলে সামনে এগোতে হবে অনবরত। জীবনের আশাহীনতা, অন্তঃসারশূন্যতা, অবসাদগ্রস্ততার মধ্য দিয়ে নিরন্তর ছুটে চলাই জীবন। এটাই অ্যাবসার্ডীয় জীবনদর্শন।

লেখক : ...আমাদের আশা নেই, কারণ ভবিষ্যৎ আমাদের জানা। আমাদের অতীত ভবিষ্যৎ একাকার হয়ে গেছে। আমরা জেনে গেছি–পেছনে যা ছিল, সামনেও তাই।

ইন্দ্রজিৎ : তবু বাঁচতে হবে?

লেখক : তবু বাঁচতে হবে। তবু চলতে হবে। আমাদের তীর্থ নেই, শুধু যাত্রা আছে। তীর্থযাত্রা। (বাদল, ১৪১৬ক : ৩১১)

ইন্দ্রজিৎ ও লেখক যেমন জীবনকে ব্যতিক্রমী দৃষ্টিতে দেখেছেন, মানসী, মাসীমা কিংবা অমল-বিমল-কমল কিন্তু সেভাবে দেখেনি; ফলে জীবন সম্পর্কে তাদের যন্ত্রণাও কম। 'অমল বিমল কমলেরা এতটাই মূঢ় যে এরা এদের অবস্থান ও অস্তিত্ব নিয়ে ভাবিত নয়। এরা জানে না, জীবন মহাকালের পরিক্রমায় মাত্র মুহূর্ত কয়েকের যোগফল। এই বুদ্বুদসদৃশ জীবনের পরিণতি এক অনির্দেশ্য শূন্যতায়। এই শূন্যতার স্বরূপ ধরে ফেলেছে ইন্দ্রজিৎ।' (জগন্নাথ, ২০০৭ : ৪৯) বৈচিত্র্যহীন গড়পড়তা একঘেয়ে জীবনের পথে মানুষের অবিরাম ছুটে চলা, অর্থহীন চক্রাকার জীবনযাপনটাই যেন সাধারণ রীতি। সাধারণ মানুষ যেন কেবল বেঁচে থাকার জন্যই বেঁচে থাকে।

> ইন্দ্রজিৎ : এই যে চলছে – তার কোনো মানে নেই? একটা বিরাট চাকা কেবল ঘুরছে আর ঘুরছে। আর আমরা তার সঙ্গে তালগোল পাকিয়ে ঘুরছি আর ঘুরছি। (বাদল, ১৪১৬ ক : ২৭৫)

অ্যাবসার্ডীয় দর্শন মানুষকে প্রথাবিরুদ্ধ কিছু প্রশ্নের সম্মুখীন করে কিন্তু সেসব প্রশ্নের উত্তর দেয় না। ফলে বেড়ে যায় ব্যক্তির অন্তর্যন্ত্রণা তবুও মানুষকে বাঁচতে হয়, এবং এটিই তার অনিবার্য নিয়তি।

> লেখক : পথ। আমাদের শুধু পথ আছে। আমরা হাঁটবো। আমার লেখার কিছু নেই, তবু লিখবো। তোমার বলবার কিছু নেই, তবু বলবে। মানসীর বাঁচবার কিছু নেই, তবু বাঁচবে। আমাদের পথ আছে, আমরা হাঁটবো। (বাদল, ১৪১৬ ক : ৩১১)

এভাবেই নাট্যিক চরিত্রসমূহের আচার-আচরণ-উচ্চারণে পাঠক-দর্শকও অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিহ্বল হয়ে আপাত অর্থহীন প্রশ্নের উত্তর সন্ধানে হয় উন্মুখ। নাট্যসমালোচকদের বিপরীতার্থক মন্তব্য[৭] স্মরণে রেখেই বলা যায়, ভাববস্তু ও কৌশলগত দিক থেকে বাদল সরকারের *এবং ইন্দ্রজিৎ* বাংলা নাটকের ধারায় অ্যাবসার্ডিজমের বৈশিষ্ট্যচিহ্নিত নাটক।

বাকী ইতিহাস [৮] নাটকে বাদল সরকার সনাতনী রীতির সঙ্গে সম্মিলন ঘটিয়েছেন অ্যাবসার্ডীয় নাট্যকৌশলের। 'নাটকের ভিতর নাটক' রীতি ব্যবহার করে আত্মহত্যা সংঘটনের কার্যকারণ অনুসন্ধানের প্রচেষ্টায় সনাতনী নাট্যাঙ্গিকের ব্যবহার লক্ষণীয়। কলকাতার মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনের প্রেক্ষাপটে শরদিন্দু ও বাসন্তীর দাম্পত্য জীবনের একটি ছুটির দিনের সকাল দিয়ে নাটকটির শুরু। চরিত্র দুটির বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়: বাসন্তীর আগ্রহ গৃহস্থালি কাজে, আর শরদিন্দুর শখ খবরের কাগজের সম্পাদকীয় কেটে বাঁধানো খাতায় আঠা দিয়ে লাগানো। বাসন্তী সাধারণ গৃহিণী, শখ করে গল্প লেখে। কলেজের সাহিত্যের শিক্ষক শরদিন্দুর সংস্কৃতিমনা বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয় আধুনিক সাহিত্যের ওপর প্রবন্ধ লেখার উল্লেখে। তার চিন্তা গতানুগতিকতার বাইরে, স্ত্রীকে গল্প লেখার ব্যাপারে উৎসাহ দেয় সে। গল্পের প্লটের

বিষয়ে তার মন্তব্য– 'প্লট? সমস্ত দুনিয়া গল্পের প্লটে ঠাসা! জীবনটাই তো গল্পের প্লট!' (বাদল, ১৪১৬ খ : ৪৫) খবরের কাগজে তাদের স্বল্প পরিচিত সীতানাথের আত্মহত্যার খবর পড়ে শরদিন্দু স্ত্রীকে গল্পের প্লট হিসেবে সেটি গ্রহণ করতে বলে। শরদিন্দু ও বাসন্তী দুজনেই আখ্যান লেখে সীতানাথ ও তার স্ত্রী কণাকে নিয়ে। বাসন্তী নির্মিত আখ্যানে দেখা যায় প্রচণ্ড দারিদ্র্যপীড়িত জীবনের অভিজ্ঞতায় কণা অভাবের চরম রূপ আশঙ্কা করে জীবনের ঝড় সামলাতে সাহস পায় না। অদ্ভুত এক দ্বন্দ্বের মাধ্যমে তৈরি হয় নাটকীয় ক্লাইমেক্স ও সাসপেন্স। জমি ও ব্যাংকের টাকা হাতছাড়া হয়ে গেছে, এই সত্যটি বেরিয়ে আসায় সে আর্থিক নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। বস্তুগত জিনিসের সঙ্গে নিজেকে একীভূত করেছে কণা, স্বামীকে বিচার করেছে অর্থনৈতিক সক্ষমতার মানদণ্ডে।

> কণা : ...তুমি আছো, মাথার ওপর ছাত আছে, খাওয়া জুটছে – শুধু তাই নয়, জমি হয়েছে, বাড়ি হবে – বাড়ি। নিজের বাড়ি। তাই বুঝতে পারি না। যখন ভাবি – এ সব যদি না থাকতো, আর – কেউ এসে বলতো – তোমাকে খেতে দেবো, পরতে দেবো – (বাদল, ১৪১৬ খ : ৫৫)

প্রতিটি মানুষের ভিতরে অন্যের কাছে গুরুত্ব পাওয়ার, আকাঙ্ক্ষিত হবার বাসনা থাকে। অর্থ-অন্ন-বস্ত্রের চাহিদা মেটাতে পারবে – এই আদিম কারণেই কণার মেজদি রক্ষিতা হয়েছে। স্মৃতিচারণায় মেজদি, বড়দি ও মার প্রসঙ্গে কণার দুঃখবোধ থাকলেও বাবার প্রতি প্রকাশ পেয়েছে গভীর শ্রদ্ধা ও আস্থা। বাসন্তীর সৃষ্ট আখ্যানে যেমন কণা চরিত্র নির্মাণে দুর্বলতা আছে আবার সীতানাথের আত্মহত্যার পিছনে গ্রথিত কার্যকারণ সূত্র শরদিন্দুর বিশ্লেষণে অযৌক্তিক। কণার জুয়াড়ি বাবার চাহিদা মেটাতে ব্যাংকে জমানো ও জমি বন্ধকের সমস্ত টাকা দিয়ে দেয় সীতানাথ। কণা জানলে আঘাত পাবে বলে তার পিতার হীনপ্রবৃত্তি গোপন করে সে। অথচ সীতানাথ নিঃস্ব হয়ে যাওয়ায় কণা তাকে ছেড়ে তারই ধনী বন্ধু নিখিলের কাছে চলে যায়। এই প্রবল মানসিক আঘাতেই সীতানাথ আত্মহত্যা করে। বাসন্তীর আখ্যানে অনেক অ্যাবসার্ডীয় উপাদান লক্ষ করা যায়। কণা চরিত্রটি নির্মাণে ও বিশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে বাসন্তীর সংলাপ–

> বাসন্তী : কণা কাউকেই সত্যি সত্যি ভালোবাসেনি। নিখিলকেও না, সীতানাথকেও না। ছোটবেলার একটানা দারিদ্র তাকে শুধু একটা জিনিসই শিখিয়েছে – দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পাবার ইচ্ছে। টাকার লোভ নয়, নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের লোভ। (বাদল, ১৪১৬খ : ৬৩)

বাদল সরকার 'নাটকের ভিতর নাটক' তৈরি করে শরদিন্দুর মাধ্যমে নাটকের সমালোচনা করিয়েছেন। বাসন্তীর আখ্যান বিষয়ে তার মন্তব্য – 'আমার মতে আত্মহত্যা যদি কেউ করে তবে বুঝতে হবে তার মনে কোথাও কোনো একটা অস্বাভাবিকতা বাসা বেঁধে ছিল। অনেকদিন ধরে ছিল। অর্থাৎ সে সুস্থ ছিল না।'

(বাদল, ১৪১৬খ : ৬৪) বাসন্তীর মতো তার স্বামী শরদিন্দুও একটি আখ্যান লেখে, যেখানে সে নির্মাণ করে সীতানাথের আত্মহত্যার ভিন্ন একটি প্রেক্ষাপট। শরদিন্দু নিজে মীমাংসিত যে, তার আখ্যানের সীতানাথ মানসিক রোগী, এবং সে এটি ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্ব দ্বারা ব্যাখ্যা করে। এ অ্যাখ্যানে সীতানাথ স্কুলের আদর্শ শিক্ষক; জনপ্রিয়তায় দেবতুল্য। সে-ই একদিন ছাত্র অশোককে ভ্লাদিমির নবোকভের লোলিটা পড়ার অপরাধে কঠিন শাস্তি দিতে চায়; স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিতে উদ্যত হয়। মূলত ছাত্রটিকে শাস্তি দেওয়ার মাধ্যমে সে নিজেকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করায়। গল্পের মধ্যে গল্প এবং তার মধ্যে ব্যবহৃত হয়েছে ফ্লাশব্যাক পদ্ধতি। সীতানাথ জানতে পারে তার মধ্যে আদিম পাশবিক প্রবৃত্তি রয়ে গেছে। তখন সে আর নিজেকে গ্রহণ করতে পারে না। কারণ অনেকদিন আগে চম্বলগড়ে পার্বতীর ধর্ষিত হওয়ার জন্যে সে নিজেকে দায়ী করে। পার্বতীকে সে নিজে ধর্ষণ করে না এটা সংলাপে নিশ্চিত বোঝা যায়। কিন্তু যেসব ডাকাত পার্বতীর সঙ্গে এই জঘন্য অপরাধ করে, সীতানাথ নিজেকে তাদেরই একজন মনে করে। কারণ, অবচেতনে পার্বতীর প্রতি পাশবিক বাসনা সীতানাথেরও জেগেছিল। সেই ঘটনার পর থেকে কণার সঙ্গে তার দাম্পত্য সম্পর্কও শীতল। নিজের পাশবিক সত্তাকে হত্যা করতে সীতানাথ দশ বছর স্ত্রীর সান্নিধ্য থেকেও দূরে থেকেছে। তার পাশবিকতা পুনর্জাগ্রত হয়েছে বিধু বাবুর আট বছরের নাতনী গৌরীর সংস্পর্শে। বন্ধু বিজয়ের কাছে স্বীকারোক্তিও করেছে সে। বিজয় তাকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে অনেক চেষ্টা করেছে। কিন্তু নিজের পাশবিকতা থেকে গৌরীকে রক্ষা করার জন্য আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেয় সীতানাথ। আর এ সিদ্ধান্ত নেওয়া মাত্রই গৌরীর নিরাপত্তার বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয় সে – গভীর প্রশান্তিতে ছেয়ে যায় তার অন্তরাত্মা :

> [সীতানাথের মুখে গভীর প্রশান্তি। কণ্ঠস্বর শান্ত]
>
> সীতানাথ : হ্যাঁ, বিজয়, জানি। এখন জানি। কোনোদিন–কোনোদিন আমার হাতে গৌরীর ক্ষতি হবে না। কোনোদিন না। (বাদল, ১৪১৬খ : ৮২)

বাসন্তী ও শরদিন্দু একটি লোকের মৃত্যু নিয়ে তাদের গল্প লেখার কল্পলোক থেকে বাস্তবে কথা কাটাকাটি করছে; কল্পনার জগতের সঙ্গে মিশে গেছে বাস্তব জগৎ। আখ্যান নির্মাণের পরও তাদের প্রশ্ন– 'বাসন্তী : কিন্তু সীতানাথ সত্যি সত্যি কী কারণে আত্মহত্যা করেছে আমরা কী করে জানবো?' (বাদল, ১৪১৬খ : ৮৫)

সমালোচকের মত লক্ষণীয়–

> 'দর্পণে মধ্যবিত্তের বিভিন্ন মুখ ধরা পড়েছে। কেউ বাঁচার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। আবার কারো অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ – সব একাকার হয়ে গেছে! এটাকে আমরা মধ্যবিত্ত জীবনের 'distorting reflection' বলতে পারি। অ্যাবসার্ড নাটকের এটি একটি লক্ষণ। আবার সীতানাথের যৌনবিকৃতিও অ্যাবসার্ডিটির লক্ষণ।' (কুন্তল, ২০১১ : ৫৩)

নাটকের তৃতীয় অঙ্কে নাট্যকার অ্যাবসার্ডীয় তত্ত্বের মূল আবেদনকে উপস্থাপন করেছেন পৃথিবীর বাকি ইতিহাসের প্রসঙ্গে। বাকি ইতিহাস অর্থাৎ অলিখিত ইতিহাস, যা ঘটেছে কিন্তু লিপিবদ্ধ হয়নি। সভ্যতার ব্যবচ্ছেদকে প্রবলভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন নাট্যকার। প্রতিটি সভ্যতার বিনির্মাণের ইতিহাসে রয়েছে ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়; শ্রেষ্ঠ অর্জনের সময় ঘটেছে প্রচুর মানুষের রক্তপাত। ইতিহাস নির্মিত হওয়ার সময়ে তার বেদীতলে যাদের প্রাণ বিসর্জিত হয়েছে তাদের ইতিহাস আশ্চর্যভাবে জীবনের নিরর্থকতাকে, অস্বাভাবিকতাকে নির্লিপ্তভাবে মেনে নিয়ে বেঁচে থাকে। তবে, জীবনের বীভৎসতার সামনে দাঁড়িয়ে নির্লিপ্ত থাকা গেলেও বাকি ইতিহাসকে অস্বীকার করা যায় না।

> সীতানাথ : মানুষের ইতিহাস। জীবনের ইতিহাস।
>
> শরদিন্দু : মিথ্যে কথা! এ মৃত্যুর ইতিহাস।
>
> সীতানাথ : (স্মিত হাস্যে) মৃত্যুকে বাদ দিয়ে কি জীবন হয়? (বাদল, ১৪১৬খ : ৮৮)

বাকী ইতিহাস নাটকে আশ্চর্যজনকভাবে সভ্যতার এক ব্যতিক্রমী ইতিহাস উপস্থাপন করেন বাদল সরকার। পৃথিবীর বীভৎস ইতিহাসের সমান্তরালে নিজের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক জীবনের ইতিহাস উঠে এসেছে সীতানাথের কথনে। পৃথিবীর ভয়ংকর ইতিহাস শরদিন্দুর চেতনাস্তরে একের পর এক পর্দা উন্মোচন করেছে। বহুবছর পর সে উপলব্ধি করেছে, সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় কেটে রাখার মধ্য দিয়ে সে মূলত ইতিহাসকে নথিবদ্ধ করেছে। যে ইতিহাস রক্তপাতের, দুঃশাসনের, সভ্যতা ধ্বংসের; অবচেতনে শরদিন্দু আরেক ইতিহাসের প্রত্যক্ষদর্শী; তাই সীতানাথের মৃত্যু তাকে ভাবিয়েছে। সীতানাথের সঙ্গে শরদিন্দুর কথোপকথন মূলত শরদিন্দুর আত্মজিজ্ঞাসা, আত্মব্যবচ্ছেদ, আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মখননের প্রক্রিয়া।

> শরদিন্দু : তুমি আত্মহত্যা করলে কেন সীতানাথ?
>
> সীতানাথ : তুমি আত্মহত্যা করোনি কেন শরদিন্দু?
>
> শরদিন্দু : (স্তম্ভিত) আমি? আমি আত্মহত্যা কেন করবো?
>
> সীতানাথ : কেন করবে না? যুক্তি দাও। (বাদল, ১৪১৬খ : ৮৮)

মানুষ যেকোনো বিপ্রতীপ চিন্তাভাবনার পর বোঝাপড়ার মাধ্যমে একটা জায়গায় এসে মীমাংসিত হয়। জীবনের ক্লান্তি ও পুনরাবৃত্তি মানুষকে নিঃশব্দ আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দেয়। দৃশ্যত মানুষ বেঁচে থাকলেও তা অর্থহীনতায় পর্যবসিত হয়ে মৃত্যুর নামান্তর হয়।

> সীতানাথ : বেঁচে নেই। আত্মহত্যা করছে। হয়তো আমার মতো নয়।... তারা নিঃশব্দে নীরবে বাঁচা বন্ধ করে বসে আছে।...

শরদিন্দু : তবু তো বাঁচছে?

সীতানাথ : বাঁচবার ভান করছে। (জীবনের) অর্থ যখন থাকছে না, তখন অভ্যাস সম্বল করে বাঁচবার ভান করছে। যেমন আমি করেছিলাম। যেমন তুমি করছো। (বাদল, ১৪১৬ খ : ৮৯)

নাট্যকার অ্যাবসার্ডীয় জীবনদর্শনকে আনছেন বারবার বিভিন্ন সংলাপের মাধ্যমে। আধুনিক দ্বন্দ্বক্ষুব্ধ পৃথিবীতে মানুষ অভ্যাসকে সম্বল করে বাঁচার ভান করছে। *এবং ইন্দ্রজিৎ* নাটকে ইন্দ্রজিৎ ও লেখক তাই করেছিল। কিন্তু সীতানাথ পারেনি, কারণ তার আশা ছিল না। 'সীতানাথ : না। আমার আশা ছিল না। আমার অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সব একাকার হয়ে গিয়েছিল।' (বাদল, ১৪১৬খ : ৯৪) নাটকের পরিণতিতে কী ঘটবে তার আভাস প্রথম অঙ্কেই দেওয়া হয়েছে। একপর্যায়ে কণা ও সীতানাথের দাম্পত্য জীবনের সংলাপ হিসেবে প্রথম অঙ্কের বাসন্তী ও শরদিন্দুর সংলাপ সংযোজন করায় তাদের সম-অবস্থার চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে। সীতানাথ ও শরদিন্দুর জীবনের পটভূমি অভিন্ন হয়ে গেছে। অ্যাবসার্ডীয় রীতিতে সংলাপের সমপাতন প্রক্রিয়ায় নাট্যকার শরদিন্দু ও সীতানাথকে একই জায়গায় দাঁড় করিয়েছেন–

শরদিন্দু : তুমি যাও শরদিন্দু।

সীতানাথ : আমি সীতানাথ।

শরদিন্দু : তুমি যাও সীতানাথ। (বাদল, ১৪১৬খ : ৯৫)

এমতাবস্থায় গড়পড়তা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাওয়া শরদিন্দুর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তবু বাসুদেব শরদিন্দুর পদোন্নতির সম্ভাবনার বার্তা নিয়ে আসলে নতুন করে অপ্রত্যাশিত একটি আশার স্ফুলিঙ্গ জ্বলে ওঠে তার জীবনে; যা তাকে সত্যিই বাঁচিয়ে দেয়। নাট্যকারের নির্দেশনায় তৈরি হয় প্রতীকী বাস্তবতা – 'ল্যাম্পের তারটা তুলে দৃঢ় হাতে প্লাগে ভরে দিলো। ল্যাম্পটা জ্বলে উঠলো'। (বাদল, ১৪১৬খ : ৯৬)

বাদল সরকার অধিকাংশ অ্যাবসার্ড নাটকে পাশ্চাত্যের অনুপুঙ্খ অনুসরণ না করে তাঁর নিজস্ব রীতির সংযোজন ঘটিয়েছেন। *পাগলা ঘোড়া*[৯] নাটকটির কাঠামো আপাতদৃষ্টিতে প্রথাবদ্ধ মনে হলেও তা অ্যাবসার্ড লক্ষণাক্রান্ত। অ্যাবসার্ড নাটকে বাস্তব জগৎকে স্বীকার করে অবাস্তব রূপকল্প নির্মাণ করে জীবনের গভীর সত্যকে ধরার চেষ্টা করা হয়। দুই অঙ্কে বিভক্ত এ নাটকের প্রত্যেক চরিত্রকে অন্তর্জগতের অপরাধবোধের সম্মুখে দাঁড় করিয়েছেন নাট্যকার। পাগলা ঘোড়া পাশ্চাত্য পুরাণে সাধারণ অর্থে মৃত্যুর প্রতীক হলেও এ নাটকে তা মানুষের প্রেমাকাঙ্ক্ষা তৃষ্ণার প্রতীকে উপস্থাপিত। প্রণয়প্রাপ্তির প্রত্যাশা ও গভীর আকাঙ্ক্ষা মানুষের হৃদয়ে থাকলেও কখনও কখনও তা অনাগ্রহে রূপান্তরিত হয়। এ কারণেই নাটকে শশী, হিমাদ্রী, সাতু ও কার্তিক তাদের স্বীয় জীবনে ভালোবাসাকে অবহেলা ভরে প্রত্যাখ্যান করে কিংবা সাগ্রহে বরণ করতে অনীহা প্রকাশ করে। কিন্তু চারজন নারীর প্রদীপ্ত

ভালোবাসার অচরিতার্থ রূপ অদম্য অভিলাষে তাদের দিকে পাগলা ঘোড়ার মতো ছুটে আসে। স্বীকারোক্তিমূলক এ নাটকে এক রাতে চার যুবক এক অনাত্মীয়া তরুণীর মৃতদেহ সৎকার করতে শ্মশানে নিয়ে আসে। মৃতদেহটি চিতায় জ্বলতে থাকাকালীন তারা মদ্যপানের নেশায় নিজেদের জীবনে প্রেমকে গ্রহণ না করতে পারার অক্ষমতার কথা বিষাদভরে স্বীকার করে। চারজনের সংলাপের মাঝখানে আলোর প্রক্ষেপণে মেয়েটি আলোকিত হলেও অন্য চরিত্রগুলো অন্ধকারে চলে যায়। এভাবে ক্রস ডায়লগ তৈরি করে কাহিনিসূত্র দর্শকদের সামনে উপস্থাপন করেছেন নাট্যকার–

> মেয়েটা : সত্যি? বুক জ্বলা আর বুক জুড়োনো – একই কথা? সত্যি? সত্যি বলছো? (পেছনের দিকে আঙুল দেখিয়ে) তাহলে ওই যে ধু ধু করে আগুন, ও কি জ্বলছে? না জুড়োচ্ছে? (বাদল, ১৪১৬খ : ৩৮৫)

নাট্যকার তাস খেলার অনুষঙ্গ এনে জীবনকে তাসখেলার রূপকল্পে উপস্থাপন করেছেন। চিতার ভিতরে জ্বলন্ত নারীকে দেখানো হচ্ছে; তার সম্পর্কে ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন সূত্র উন্মোচন করেছেন নাট্যকার। কুকুরের আর্তচিৎকার পাপ ও অপরাধের অনুশোচনার প্রকাশ কিংবা ভালবাসা ও বিশ্বাসের ক্রমমৃত্যুর প্রতিকল্প হিসেবে রূপায়িত হয়েছে। আখ্যানের ভিতর আখ্যান, সংলাপে লোকায়ত ছড়ার ব্যবহার, একটি চরিত্রের সংলাপের গাঁথুনিতে আরেকটি চরিত্রের অনুপ্রবেশ – এসব প্রাকরণিক বৈশিষ্ট্য নাটকে অ্যাবসার্ডীয় আবহ সঞ্চার করেছে। চারটি নারী চরিত্র পাগলা ঘোড়ার মতো ছুটে এসেছে তাদের কাছে, যাদের তারা জীবনে পায়নি, যাদের দ্বারা তারা প্রবঞ্চিত হয়েছে। নাট্যকার পুরুষ চরিত্র দ্বারা প্রকাশ করছেন নারীর আবেগ অনুভূতির স্বাধীনতার প্রসঙ্গ। প্রতিটি পুরুষ চরিত্র নিজের কৃতকর্মের কথা স্মরণ করছে; অতীতের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করছে। নিজেরা অপরাধবোধে ভুগছে ও স্বীকারোক্তি দিচ্ছে অন্য চরিত্রের কাছে; প্রকারান্তরে নিজের কাছে। অ্যাবসার্ড নাটক হতাশা ও আত্মহননের বিপক্ষে। যে কোনো যন্ত্রণা সহ্য করেও মানুষ বেঁচে থাকবে এটাই *মিথ অব সিসিফাসের* মূল কথা। তাই মেয়েটা সাতদিনও অপেক্ষা করতে পারেনি, কিন্তু কার্তিককে বেঁচে থাকতে হবে –

> কার্তিক : (ধীরে ধীরে) বেঁচে থাকলে – সবই সম্ভব? সাতদিন সময় দিলো না। সাতটা দিন। আমি – আমিও – কী? তবে শেষ দেখা হয়নি এখনো? বেঁচে থাকলে সবই সম্ভব? (বাদল, ১৪১৬খ : ৪৩৮)

বিশ্বব্যাপী সামগ্রিকভাবে মানবিক মূল্যবোধ বিপর্যস্ত হওয়ায় জীবনের অর্থ খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়ে মানুষ অ্যাবসার্ডীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। কিন্তু সে অবস্থাতেও মানুষের আত্মঘাতী হওয়া উচিত নয়। ক্যাম্যু মনে করেন, সর্বব্যাপী বিপর্যয়ের সামনে দাঁড়িয়েও আত্মহত্যা কোনো সমাধান নয়। পরাজয় জেনেও প্রতিদিনের মানবিক মনোবল নিয়ে পাহাড়চূড়ায় ওঠার প্রচেষ্টায় দেবতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বেঁচে

থাকাতেই জীবনের অর্থ নিহিত। মানুষ যখন সজ্ঞানে তার বিপর্যস্ত অবস্থাকে অনুভব করে সেই অনুভবের প্রক্রিয়াই তার ট্রাজেডি। আলবেয়ার ক্যাম্যুর মন্তব্য –

> If this myth is tragic, that is because its hero is Conscious. Where would his torture he indeed, if at every step the hope of succeeding upheld him? The work man of today works every day in his life at the same tasks and this fate is no less absurd. But it is tragic only at the rare moments when it becomes conscious. (Camus, 1975 : 109)

হিমাদ্রী চরিত্রটি সারাক্ষণ বোঝাপড়ার চেষ্টায় রত। সে ভাবতে চায় মিলির মৃত্যুটি দুর্ঘটনা, আত্মহত্যা নয়। অন্যকে বলার মাধ্যমেই সে নিজের বিবেকের দংশনে ক্ষতবিক্ষত হৃদয়কে সান্ত্বনা দেয়। অ্যাবসার্ড নাট্যরীতির পাশাপাশি প্রথাবদ্ধ রীতিতে চরিত্রের ক্রমবিকাশ, দ্বন্দ্ব-অর্ন্তদ্বন্দ্ব, ট্রাজিক পরিণতি উন্মোচন করেছেন নাট্যকার। 'বিচিত্ররূপিনী নারী প্রকারান্তরে পুরুষের জীবনে একই নারীসত্তায় আবির্ভূত হয়। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবনকে দেখতে গিয়ে নাট্যকার জীবনের নানা অধ্যায়কে একাকার করে ফেলেন এই নাটকীয় কৌশলে।' (দর্শন, ২০০৮ : ৮২) হিমাদ্রী, কার্তিক, শশী কিংবা সাতু কেউই তাদের জীবনের সেই কাঙ্ক্ষিত নারীকে পেয়েও ধরে রাখতে পারেনি। একেকটি চরিত্র উন্মোচিত হয়েছে অন্য চরিত্রের প্রশ্নের উত্তরের দ্বারা – এই অ্যাবসার্ডীয় রীতিটিকে নাট্যকার প্রয়োগ করেছেন। প্রবঞ্চিত-অতৃপ্ত ভালোবাসা যা জীবনের কাছে পরিণতি পায়নি, মৃত্যুর পর তা ফিরে এসেছে বিবেকের দংশনে।

> মেয়েটা : (আর্ত চিৎকারে) নামিয়ে নিয়ে এসো! এখনো পুড়ে শেষ হয়নি – এখনো জ্বলছে – নামিয়ে নিয়ে এসো – পাগলা ঘোড়া! ফিরিয়ে নিয়ে এসো – আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে এসো – পাগলা ঘোড়া –! (বাদল, ১৪১৬খ : ৪৩৮)

পাগলা ঘোড়া নাটকে প্রথাবদ্ধ নাটকের মতোই ক্রমপরিণতি দেখিয়েছেন বাদল সরকার। কার্তিককে বাঁচার মন্ত্রে উজ্জীবিত করে অ্যাবসার্ড দর্শনকে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা করেছেন নাট্যকার।

জীবনের সীমাহীন শূন্যতা ও বিচ্ছিন্নতা মানুষকে ভয়ঙ্কর, গ্লানিময়, যন্ত্রণাদগ্ধ এক পৃথিবীকে প্রত্যক্ষ করায়, *সারারাত্তির*[১০] সেই অভিজ্ঞতার প্রতীকী রূপায়ণ। এ-নাটকে নাট্যকার অপূর্ব ব্যঞ্জনায় পাঠককে দাঁড় করিয়েছেন এক ভয়াবহ সত্যের সম্মুখে। কাহিনিপটে দেখা যায়, ঝড়বৃষ্টির রাতে এক দম্পতি আশ্রয়ের জন্য হাজির হয় অন্ধকার রহস্যময় প্রায় ভাঙাচোরা এক বাড়িতে। যেখানে এক বৃদ্ধ সময়ের সামনে অন্তহীন প্রতীক্ষা নিয়ে বহুকাল ধরে বসবাস করছে। বাড়িটার মতোই অদ্ভুত আর রহস্যময় সেই বৃদ্ধ। ঘটনার এক পর্যায়ে স্বামীর অনুপস্থিতিতে নারীটি বৃদ্ধের সঙ্গে ভালোবাসা আর চাওয়া-পাওয়ায় অন্ধকারে একাকার হয়ে যায়। সাত বছর সংসার করেও স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরকে জানতে পারে না, কিন্তু এক রাত্রির অন্ধকারের

নিবিড়তা তাদের অন্তর্জগতকে দর্পণের মতোই যেন তাদের পরস্পরের সম্মুখে উন্মোচন করে দেয়।

> স্ত্রী : ...আজ যতো মাঝরাত্রের ঘুমভাঙা জানলা এসে মিশেছে এই ঘরে, এ জেগে-থাকা রাতে। আমার যতো শূন্যতা যতো রিক্ততা সব এই ঘরে, এই জেগে থাকা রাতের আগুনে জ্বলে গলে ঝালাই হয়ে তৈরি হয়েছে একটা ধারালো অভাব। আমি চাই। আমি রঞ্জনকে চাই। (বাদল, ১৪১৬ক : ৩৪৮)

অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের ভেতরে চেতনাগত ব্যবধান ভেঙে গেলে মানুষ অনিকেত হয়ে পড়ে। নিজের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রক্রিয়া ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় নিরস্তিত্ব মানুষ নিরর্থক সত্তা নিয়ে জীবন্মৃতের মতো টিকে থাকে। ক্রমাগত একঘেয়ে জীবনকে বহন করেও মানুষ বেঁচে থাকে। আধুনিক জীবনে বোধ ও উপলব্ধি জাগ্রত হলে মানুষ এই চক্র ভেঙে বেরিয়ে আসতে চায়। সেই বেরিয়ে আসার মধ্যে কখনও নিজেকে শেষ করে দেওয়ার ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়া থাকে, কখনওবা জীবন যেমন, তাকে সেভাবে গ্রহণ করেই মানুষ পথ চলে। অ্যাবসার্ড জীবনদর্শন মানুষকে অদ্ভুত এক জীবনবোধের সম্মুখীন করে এবং তখন নিজের পথ নিজেকেই খুঁজে নিতে হয়। জীবনকে সহজভাবে গ্রহণ করা ও বেঁচে থাকাকে উপভোগ করাই অ্যাবসার্ড তত্ত্বের মূল কথা। প্র প্রসঙ্গে পবিত্র সরকারের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য –

> নাটক তো গীতিকবিতার মতোই কখনও কখনও নাট্যকারকে প্রত্যক্ষ করায়, এবং ইন্দ্রজিৎ, সারারাত্তির এবং পরবর্তী আরও কিছু নাটক বাদলবাবুর ক্ষেত্রে তাই করেছে, অন্যদের গল্পে তাঁর নিজেরও গল্পের বয়ন ঘটে গেছে।...সারারাত্তির-এ এবং ইন্দ্রজিৎ-এর হাস্যরসের সুযোগ প্রত্যাহার করেছেন তিনি, খুব বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষায় যাননি, কিন্তু কাব্যময় সংলাপে তিনটি চরিত্রের মধ্যে একটি টেনশন তৈরি করে, নায়িকাকে প্রবল আত্মসমীক্ষার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন । এ দুটি নাটকে নাট্যকার নানাভাবে উপস্থিত। এখানে তাঁর অন্তর্ভাবনার তির্যক ও বহুমুখী প্রকাশ। (বাদল, ১৪১৬ক : এগারো)

সারারাত্তির নাটকের কোনো চরিত্রের নাম নেই, তাদের আলাদা কোনো পরিচয়ও নেই। নামহীন ব্যক্তিপরিচয়হীন প্রতীকী চরিত্রগুলোর কারো পরিচয় স্ত্রী, কেউ পুরুষ আবার কেউবা বৃদ্ধ। জীবন ও মৃত্যুর মাঝামাঝি অপেক্ষারত বৃদ্ধ চরিত্রটি সারারাত জেগে থেকে অভিজ্ঞতার ভারেই হয়েছে ঋদ্ধ। আধুনিক মানুষের বিশ্বাসহীন মৃতকল্প জীবনের বৈরাগ্য ও বিষাদ এবং শরণহীন মৃত্যুপ্রতীক্ষা উপস্থাপিত হয় অ্যাবসার্ড নাটকে। সারারাত্তিরের এই জেগে থাকা চৈতন্যই ব্যক্তিকে জীবনের দ্বান্দ্বিক সত্তার মুখোমুখি দাঁড় করায় এবং অনিবার্যভাবে সেখানে তৈরি হয় কিছু জিজ্ঞাসা –

> যা হবার হোক। সারারাত্তির
> তবু তো দু'চোখ সারারাত্তির

মনের স্বপ্ন তবু তো দুচোখ মেনেছে।
শেষ হয় হোক। তবু তো রাত্রি–
অসম্ভবের সম্ভাবনাকে জেনেছে। (বাদল, ১৪১৬ক : ৩৫৬)

রাত্রির নীরবতায় ব্যক্তির অনবরত আত্মানুসন্ধান বাইরের জগতের নিরবচ্ছিন্ন অনুসন্ধানের সঙ্গে তৈরি করে এক দ্বন্দ্ব। জীবনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতায় বৃদ্ধের দার্শনিকতার অনুষঙ্গে স্ত্রী ও পুরুষের জীবনচেতনা ও জীবনপিপাসা পৌঁছায় এক নবতর মাত্রায়। 'অ্যাবসার্ড নাট্যকাররা আপাত অসঙ্গতির আড়ালে নাটকের পটভূমিতে এই অসমঞ্জস পৃথিবী, বিশ্বাসচ্যুত অর্থহীনতাময় পৃথিবীর অপ্রকৃতিস্থতা থেকে জীবনের নতুনতর অর্থ আবিষ্কারের পথ সন্ধান করে চলেছেন এবং তা ঘটছে নাটক ও দর্শকের গভীরতর মানসিক আন্তস্ক্রিয়ায়।' (মেহের, ১৪০৫ : ৮)

অ্যাবসার্ড নাটকে জীবনের অসঙ্গতির অসংলগ্ন প্রকাশের অন্তরালে নিহিত থাকে মানুষের শরণহীন জীবনের গভীর 'অ্যাবসার্ডিটি', যা লক্ষ করা যায় *প্রলাপ*[১১] নাটকে। এ নাটকের মুখবন্ধ থেকে জানা যায়, একটি বিদেশি নাটকের কাঠামো দ্বারা প্রভাবিত হলেও নাটকের বক্তব্য ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং সংলাপ নাট্যকারের নিজস্ব। নাটকে অ্যাবসার্ডিটির বৈশিষ্ট্য প্রতীয়মান হয় চরিত্রগুলোর জীবন অন্বেষণের অভিপ্রায়ের মধ্য দিয়ে। নাটকের প্রারম্ভে ফটিক চরিত্রের সংলাপে উঠে আসে, '...মনুষ্য নামক জীবের ব্যক্তিগত অথবা সামগ্রিক কোনো তাৎপর্য আদৌ আছে কি না, না থাকলে কেন নেই, এবং থাকলে তার রূপ ও রূপান্তর কি প্রকার?' (বাদল, ১৪১৬ খ : ২৩৩)

'নাটকের ভেতর নাটক' পদ্ধতিতে রচিত *প্রলাপ* নাটকের আখ্যানভাগে দেখা যায়, প্রত্যেকটি চরিত্র জীবন অন্বেষার নিরন্তরধর্মের রূপায়ণকল্পে একটি নাটক করতে চাইছে। বাস্তবতা হলো, জীবন অন্বেষণের কোনো সমাপ্তিরেখা নেই, তাই এই নাটকের যবনিকা বলেও কিছু নেই। 'নাটকে নাট্যকার ভাসা-ভাসা, আবছায়া একটা জীবনের কথা খুঁজে ফেরেন। সেই জীবনও তো একটা নাটক নয়, তার ছায়ামাত্র। জীবনে নাট্যবিহীন প্রকল্পের নাটককে গাঁথতে গিয়ে বাদল সরকার সেই আবছায়া আঙ্গিকও নির্মাণ করেছেন। নাটকে কোনো অঙ্ক নেই, বিক্ষিপ্ত কয়েকটি দৃশ্য ছাড়া কিছু দৃশ্য বিন্যাস ফুটে ওঠে।' (দর্শন, ২০০৮ : ৭৭)

তরুণসহ নাটকের অন্য সব চরিত্রকে পীড়িত করে জীবনের আশাহীনতা, অর্থহীনতা ও একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি। এই পীড়া যেন নাট্যকার বাদল সরকারেরই অনুভবজাত। তবে অ্যাবসার্ডবাদ মূলত একটি দর্শন যেখানে নেতিবাচকতা, হতাশা, পরাজয় থাকলেও এগিয়ে যাওয়ার আশাবাদ শোনানো হয়। তাই তরুণ চরিত্রটির মাধ্যমে নাট্যকার উচ্চারণ করেন–

তরুণ : আমি আশাবাদী, প্রত্যেকবার আশা করি একটা কিছু তফাৎ হবে, একটু অন্যরকম হবে।

ছায়া : আমার চণ্ডীমামাও আশা করতেন, বিয়ের পরদিন থেকে রোজ তেরো বছর ধরে সমানে আশা করে শেষে সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন। (বাদল, ১৪১৬ খ : ২৪৯)

আশাবাদের মধ্যেও সৃষ্টি হয় অনাস্থা, হতাশা ও দ্বন্দ্ব। কাহিনিবিহীন এবং কোনো ঘটনাক্রম ছাড়াই জীবন অন্বেষার এই নাটকে শেষাবধি মানুষের জীবন কোনো অর্থই খুঁজে পায় না। অ্যাবসার্ডবাদ মানুষকে হতাশাগ্রস্ত করলেও নেতির অতলে নিশ্চিহ্ন হতে দেয় না বরং জীবন যেখানে যেমন তাকে সেভাবে গ্রহণ করতে শেখায়। সমালোচক আতাউর রহমান বলেন–

অ্যাবসার্ড থিয়েটার এই অনুসন্ধানেরই একটি মাধ্যম যা সাহসের সঙ্গে পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে জীবনের অর্থ হারিয়ে ফেলা অধঃপতিত মানুষদের জন্য। জীবনের নিশ্চিন্তিকে হারিয়ে ফেলার দুঃখবোধকে অ্যাবসার্ড থিয়েটার চেষ্টা করছে এক অদ্ভুত আপাত বিরোধী সত্যের মাধ্যমে তুলে ধরতে। আজকের বর্ণহীন পৃথিবীর মানুষের তীক্ষ্ণতম জীবন-জিজ্ঞাসার উত্তর দেয়ার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে এই নাটক। (আতাউর, ১৯৭৩ : ৯৬)

জীবন হলো সিসিফাসের মতো প্রতিনিয়ত পর্বতশৃঙ্গে পাথর তোলার মতোই; প্রচণ্ড পরাভব সত্ত্বেও বেঁচে থাকার চেষ্টা করে যাওয়া। তবে অনবরত অন্বেষণের মধ্য দিয়ে মানুষ একসময় খুঁজে পাবে জীবনের তাৎপর্যবহতা এবং সেদিন সত্যিকারের নাটক সৃষ্টি হবে বলে নাট্যকার আস্থা রাখেন।

Murray Schisgal এর *The Tiger* অবলম্বনে বাদল সরকার রচনা করেছেন কৌতুকপূর্ণ আবহে হালকা মেজাজের দুই চরিত্রবিশিষ্ট একাঙ্ক নাটক *বাঘ* [১২]। অস্তিত্ব সংকটে নিপতিত জীবন-প্রতিবেশের সংশ্লেষে বিচিত্র বোধে উপনীত হয়ে জন্ম নেয় 'অদ্ভুত মানুষ'[১৩]। নাটকে এক তরুণ নিজেকে বাঘ ভাবতে শুরু করে এবং নিজের বাসস্থানকে বাঘের ডেরা বলে বিশ্বাস করে। সংযোগের অভাব, নিঃসঙ্গতা, নির্জনতা ও ক্ষুব্ধ যন্ত্রণা তার এই অদ্ভুত মনস্তত্ত্ব তৈরি করেছে। তথাকথিত ভদ্রতা-সভ্যতার মুখোশ পরা মানুষগুলো যেমন জান্তব-নোংরা আচরণ করে, তরুণটিও এক তরুণীকে কিডন্যাপ করে এনে নিজেকে তাদের মতো প্রমাণ করতে চায়। শেলি-কিট্স-এলিয়ট-রবীন্দ্রনাথ পড়া মনুষ্যত্বকে ধারণকারী ছেলেটি মেয়েটিকে কটূক্তিমূলক বাক্যবাণে জর্জরিত করার মধ্য দিয়ে অবক্ষয়িত সমাজের ক্ষুব্ধ সমালোচনা করে। বন্ধুত্বের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে একাকিত্বের ভয়াবহতা থেকে মুক্তির আশ্বাসে জীবনের অঙ্ক নির্ভুলভাবে সে শিখে নেয় মেয়েটির কাছে।

মেয়েটি : (একটু চুপ করে থেকে) আচ্ছা তুমি–তুমি আমার কাছে অঙ্ক শিখবে?...

বাঘ : সপ্তায় দু'দিন? তুমি আসবে? এখানে? আমার ঘরে? (বাদল, ১৪১৬খ : ১১৭)

> স্বয়ং বাদল সরকার বাঘ নাটকের মুখবন্ধে লিখেছেন, 'মফঃস্বলে গ্রামেগঞ্জেও এ নাটক গৃহীত হয়েছে, যা আমি একেবারেই ভাবিনি। সম্ভবত বাঘ-এর মূল বিষয় বন্ধুত্ব – এ কারণেই।' (বাদল, ১৪১৬খ : ১০০)

হালকা চালের কমেডি রসের ছন্দে গাঁথা সংলাপের নাটক *যদি আর একবার*[১৪]। এ নাটকে বাদল সরকার অ্যাবসার্ডিটির নতুন মাত্রায় জীবনের এক সহজ সমাধান দিয়েছেন। দুই দম্পতি রতিকান্ত-করুণা ও সঞ্জয়-অতসী এবং এক অবিবাহিতা নারী বনলতা রায়কে ঘিরে নাটকটির কাহিনি নির্মিত। মানুষের যাপিত জীবনের অভ্যস্ততায় অর্থহীনতা ও একঘেয়েমি অনবরত পীড়া দেয়। জীবনের চাওয়া-পাওয়ার অসম সমীকরণের অতৃপ্তি প্রতিনিয়ত তাদের ক্লান্ত করে এবং সৃষ্টি হয় অ্যাবসার্ডীয় পরিপ্রেক্ষিত। ধরাবাঁধা গণ্ডির বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে মানুষের মন নতুন সুখের খোঁজে নবতর আকাঙ্ক্ষায় অদেখা এক জীবনের হাতছানিতে বিভ্রান্ত হয়। অস্তিত্ব সংকটে নিমজ্জিত ব্যক্তির অর্থহীন অনুসন্ধান ও প্রগতিহীন অবিরাম গতি অ্যাবসার্ডীয় আবহ তৈরি করে। অলৌকিকতার ছোঁয়ায় সেই জীবন যদি পেয়েও যায়, মোহভঙ্গের পর সে আগের অভ্যস্ত জীবনেই ফিরে যেতে চায়। মানুষ তার ভবিষ্যৎ জেনে গেলে সে অতীতের সঙ্গে তুলনায় হতাশ হয়ে পড়ে ও জীবনের প্রতি অনীহা তৈরি হয়। নাটকে সত্যসিন্ধুর কণ্ঠে আবৃত্তি–

> ...ভুলপথে মোড় ঘুরে সবই যদি হাহাকারে ডোবে,
> অতীতের প্রতারণা বর্তমান ডোবায় বিক্ষোভে–
> তবে কী বা আসে যায় সভ্যতার আয়ুক্ষয় হলে?
> পৃথিবী যাক না ঘুরে, দিন আসুক, দিন যাক চলে। (বাদল, ১৪১৬ খ : ২০৫)

এই অবস্থায় অ্যাবসার্ড তত্ত্বের মূল কথা হল, ভেঙে না পড়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে জীবনকে ইতিবাচকতার সূত্রে ব্যাখ্যা করা। কারণ, প্রগলভ আশার কৃত্রিম বাণীতে ভুলিয়ে জীবনের কঠিন ও অমোচ্য বাস্তবতাকে স্বীকার করাই অ্যাবসার্ড নাটকের উদ্দেশ্য। আদর্শ-লক্ষ্য-উদ্দেশ্যবিচ্যুত পৃথিবীর স্বরূপ দর্শকদের সামনে উন্মোচন করাই এ নাটকের লক্ষ্য। মানুষের এই অমোচ্য, অপ্রতিরোধ্য অবস্থা এবং অবস্থানকে শিল্পিত করে অ্যাবসার্ড নাটক। হাস্যরস ও লঘুরসের ব্যবহারে নাটকে কমিক উপাদান গড়ে উঠলেও তা প্রায়ই বিষাদময় গভীরতার ইশারা দেয়। *যদি আর একবার* নাটকটিতে জে. এম. ব্যারির *Dear Brutress* নাটকের প্রেরণা থাকলেও এ নাটকে নাট্যকার বাদল সরকার জীবনের এক গভীরতর দর্শনের ঘোষণা দিয়েছেন। 'নাটকটিকে আছে এক অনাস্বাদিত রূপকথার আমেজ। এর ফলে তৈরি হয় এক অবিশ্বাস্য পরিস্থিতির বাতাবরণ। তার ফলে এক অ্যাবসার্ড পরিপ্রেক্ষিতের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।' (জগন্নাথ, ২০০৭ : ১২)

ত্রিংশ শতাব্দী [১৫] নাটকটি সভ্যতার ইতিহাসের এক অভিশপ্ত এবং কলঙ্কিত অধ্যায়ের দলিল :

> ১৯৪৫ এর ৬ অগস্ট সকালে জাপানের হিরোশিমা শহরের ওপর পৃথিবীর প্রথম পারমাণবিক বিস্ফোরণে যেমন প্রাণ হারায় প্রায় আড়াই লক্ষ লোক তেমনি পরবর্তী কয়েক পুরুষ এই ভয়াবহ কারণে বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মায়। এহেন সর্বনাশা পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতাই ত্রিংশ শতাব্দী নাটকের পরিপ্রেক্ষিত। গোটা মানব প্রজাতির এবং একই সঙ্গে ব্যক্তি মানুষেরও প্রবল সংকটের রূপ নাট্যকার বাদল সরকার মর্মস্পর্শীভাবে তুলে ধরেছিলেন। (সন্ধ্যা, ১৪১৪ : ৩৯)

নাটকের সঞ্চালক চরিত্র বাংলা সাহিত্যের ভূতপূর্ব অধ্যাপক শরৎ চৌধুরী এবং ফিজিসিস্ট সাধন ব্যানার্জি প্লানচেটের মাধ্যমে সেইসব লোকের আত্মা নামিয়ে আনে যারা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে বোমাবর্ষণে সংশ্লিষ্ট ছিল। মার্কিন বিমানবাহিনীর মেজর টমাস ফেরেবির ওপর ভার ছিল অ্যাটম বোমের সম্ভাব্য লক্ষ্যস্থল নির্বাচন করার। ফেরেবিকে বাক্যবাণে জর্জরিত করে তার মনের অপরাধবোধের স্বীকারোক্তি নিতে চেয়েছে কথক। নাগাসাকির বোমারু বিমানের পাইলট ছিল মেজর ইথারলি, যে যুদ্ধ পরবর্তীকালে মানসিক যন্ত্রণা আর অনুশোচনায় উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল। মিসেস ইথারলি থেকে জানা গেছে, অনুশোচনাগ্রস্ত ইথারলির ভয়ংকর পরিণতি ও তাদের বিবাহ-বিচ্ছেদের কথা। তারপর আসলেন হিরোশিমা ইউনিভার্সিটির এমেরিটাস প্রফেসর ডক্টর আরাতা ওসাদা, যিনি ১৯৫১ সালে বত্রিশটা স্কুল কলেজ থেকে হিরোশিমার অভিজ্ঞতার ওপর প্রায় দুই হাজার রচনা লিখিয়েছিলেন। আসেন মিচিহিকো হাচিইয়া, যিনি রেডিও অ্যাক্টিভিটির প্রথম পরীক্ষক ডাক্তার। মিৎসুবিসি কারখানার ইনজিনিয়ার এনেমন কাওয়াগুচি, জাহাজের খালাসি সাঞ্জিরো মাসুদা এবং সবশেষে বিজ্ঞানী প্রফেসর অ্যালবার্ট আইনস্টাইন, যাঁর তত্ত্বকে ভিত্তি করে আবিষ্কৃত হয় হাইড্রোজেন বোমা। কুৎসিত ধ্বংসলীলা আর মানবতার বিনষ্টি এই শতাব্দীকে করে তুলেছে বিকলাঙ্গ-বিকৃত, যার দায়ভার প্রত্যেক মানুষকেই নিতে হবে। নাটকের শেষে শরৎ চৌধুরী বিংশ শতাব্দীর প্রতিনিধি মানব হিসেবে ত্রিংশ শতাব্দীর কাছে কৈফিয়ৎ দিয়ে নিজের শতাব্দীকে নির্দোষ প্রমাণ করতে চাইছে। নাটকে ত্রিংশ শতাব্দীর উপস্থিতি-কল্পনাতেই অ্যাবসার্ডধর্মিতার লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে :

> শোনো! ত্রিংশ শতাব্দীর অমৃতের পুত্ররা শোনো! তোমাদের অমৃত–আমি! তোমাদের অমৃত মন্থিত হয়েছে আমার শতাব্দীর বিষে! তোমাদের জন্ম আমার শতাব্দীর যন্ত্রণাবিকৃত গর্ভবেদনায়। কাকে বিচার করছো? নিজের মাকে? গর্ভধারিণীকে? বলো! জবাব দাও! (বাদল, ১৪১৬খ : ৩৩৪)

পৃথিবীর যাবতীয় মানবিক প্রাণের আর্তি যুদ্ধের ধ্বংসলীলা নয়, শান্তির অনাবিল আকাঙ্ক্ষা। উননব্বই বছরের বার্ট্রান্ড রাসেল বোমা তৈরির বিরুদ্ধে জীবনের ঝুঁকি

নিয়ে কারাবরণ করেন। অ্যাবসার্ড নাটক কখনো স্বপ্ন, অতিকল্পনার মধ্য দিয়ে জীবনের অর্থহীনতাকে উপস্থাপন করে। দর্শককে সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করানো বাদল সরকারের অ্যাবসার্ড নাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জীবনের অর্থময়তা এবং সম্পর্কের টানাপড়েন প্রতিকূল পরিবেশের পটভূমিতে উপস্থাপন করেন নাট্যকার। ব্যক্তির বেঁচে থাকার সার্থকতা কিংবা ব্যর্থতার দায়ভার একান্তভাবে নিজেকেই বহন করতে হয়। অস্তিত্বের শূন্যতা পূরণে ব্যর্থতার কারণেই মানুষ অপরাধবোধ করে এবং সেখান থেকেই বেঁচে থাকার প্রতি অনীহা সৃষ্টি হয়।

বাদল সরকারের *শেষ নেই* [১৬] নাটকের সিদ্ধান্ত হল, মৃত্যু কোনো সমাধান দেয় না, জীবন থেকে পালিয়ে যাওয়া পরাজয়েরই নামান্তর; বরং বেঁচে থেকেই জীবনকে মহিমান্বিত করা সম্ভব। অ্যাবসার্ডীয় আবহে রচিত *শেষ নেই* নাটক বাদল সরকারের পরিবর্তনশীল নাট্যভঙ্গির এক অভিনব বিন্যাস। আদালতকক্ষে বিচারের মঞ্চে কেন্দ্রীয় চরিত্র সুমন্তর জবানবন্দীর মাধ্যমে উন্মোচিত হয়েছে *শেষ নেই* নাটকের দৃশ্যপট। গান্ধীবাদের বিপরীতে বিপ্লবের মন্ত্রে সমাজবদল ও স্বাধীনতা অর্জনের স্বপ্ন দেখে সুমন্ত। কিন্তু ক্রমান্বয়ে বিপ্লবী এই পার্টির ক্রিয়াকলাপ আর শ্রেণিচরিত্র সুমন্তকে হতাশ করে। যে নিঃস্বার্থ দেশাত্মবোধের আদর্শকে অবলম্বন করে সে অগ্রসর হতে চায়, দলের রাজনৈতিক নীতির মধ্যে তার ছিটেফোঁটাও নেই। রাজনীতি ছেড়ে আবার সে পড়ালেখায় মন দেয় এবং কর্মজীবনে প্রবেশ করে আদর্শহীন প্রতিবেশে আবারও হতাশ হয়। স্বীয় আত্মিক পরিতৃপ্তির দায়বোধ থেকে আদর্শের প্রকাশ ঘটাতে সবকিছু ছেড়েছুড়ে সে কবিতা লিখতে শুরু করে। কবিখ্যাতি লাভে অভিনন্দিত হয়েই সে ক্ষান্ত হয় না, কবিতার ভাষায় গণমানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে চায়। বিমর্ষ চিত্তে সুমন্তের উচ্চারণে উঠে আসে অন্তবিহীন পথের অনুষঙ্গ। *শেষ নেই* নাটকে সুমন্ত চরিত্রের মধ্য দিয়ে বাদল সরকারের ব্যক্তিজীবনের কথাই উঠে এসেছে। অপরিণামদর্শী রাজনীতির ঘূর্ণিপাক থেকে বের হয়ে জীবনের আদর্শিক পথ অন্বেষণে চাকরি ছেড়ে দিয়ে কবিতা লেখার মাধ্যমে বাদল সরকারও সাহিত্যচর্চা শুরু করেছিলেন; মানুষের জীবনের বাস্তবতা তুলে আনতে এসেছিলেন নাটকের পথে। ব্যক্তির-সমাজের-সভ্যতার অগ্রগতির পথে বলিদানকারী প্রাণের প্রতি সুমন্তর সহানুভূতিসিক্ত বক্তব্যে স্বয়ং নাট্যকারের কণ্ঠস্বরই ধ্বনিত হয়। যে লোকটা ফুটপাতে শুয়ে থাকে, না খেতে পেয়ে মরে সে জীবনের বাইরে, আইনের বাইরে হলেও তাকে ভোলা যায় না, মানা যায় না। যারা দাঙ্গায় মরেছে, বেয়নেটের খোঁচা খেয়ে কাঁটাতারে ঝুলছে, বোমায় ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে, তারাই ফিরে ফিরে আসে সুমন্তর বেআইনি দুঃস্বপ্নে। ইতিহাসের অসম্পূর্ণ অধ্যায় অতিক্রম করে নাট্যকার জীবনের অর্থ খোঁজেন মেহনতি মানুষগুলোর লড়াই-সংগ্রামের মধ্যে। প্রসঙ্গত সমালোচকের অভিমত স্মর্তব্য –

> ইতিহাসের শত অবিচার ও ধ্বংসের মধ্যেও মানুষ বেঁচে আছে। মানুষই মানুষের শেষ আশ্রয়। এ-বিশ্বাস নাট্যকারের।... বাকী ইতিহাস-এর শরদিন্দুর স্বার্থনিমগ্ন সুখস্বপ্ন, ত্রিংশ শতাব্দীতে শরতের স্বেচ্ছা নির্বাসন, শেষ নেই-তে সুমন্তের নিশ্চিত সাফল্যের বৃত্ত – কোনোটাই জীবনের শেষ কথা নয়। (দর্শন, ২০০৮ : ৮৬)

অ্যাবসার্ড নাটক পরাভবের শিল্প নয়। নৈর্ব্যক্তিক বাস্তবতার এ নাটক আমাদের হতাশার অন্ধগহ্বরে নিমজ্জিত করে না, মানুষকে তার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করে। নাট্যসমালোচক কবীর চৌধুরীর ভাষায় –

> এ্যাবসার্ড নাটকের লক্ষ্য দর্শক-পাঠকের মনের গভীরতম স্থানে গিয়ে আঘাত হানা, তার চিত্তে যে-আতঙ্ক, যে-নৈরাশ্য, যে-শূন্যতাবোধ, যে-অবদমিত ভালোবাসা-ঈর্ষা-ঘৃণা-লোভ-আশা-আকাঙ্ক্ষা-লালসা-উদ্বেগ লুকিয়ে আছে তাকে তুলে আনা, মুক্ত করা, চারপাশের ক্ষয়িষ্ণুতার মুখোমুখি তাকে দাঁড় করিয়ে, চূড়ান্ত বাস্তবতার সত্যকে উপলব্ধি করার পর, প্রত্যেক দর্শক-পাঠককে তার নিজের মতো করে নতুন সংহতি গড়ার প্রেরণা যোগানো। (কবীর, ১৯৮৫ : ৯৩)

বাদল সরকারের নাটকে অ্যাবসার্ডীয় জীবনদর্শন ও নাট্যতত্ত্বের প্রায়োগিক রূপ পেয়েছে সার্থকতা ও সাফল্য। তাঁর অ্যাবসার্ড নাটকে অস্তিত্ব সংকটে নিমজ্জিত মানুষ নৈরাশ্যের অতলে থেকেও সঞ্চার করে জাগরণের উপলব্ধি। জীবনের বিদ্যমান ক্লান্তি, অবসাদগ্রস্ততা ও নিরস্তিত্বরূপের সমান্তরালে অভিব্যক্ত হয় যেন রাবীন্দ্রিক ইতিবাচকতার ইঙ্গিত। আধুনিক মানুষের অভিজ্ঞান ও আত্ম-অন্বেষণ রূপায়ণে গভীর জীবনবাদী দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষণীয় আলোচ্য নাটকসমূহে। মানুষের অন্তর্জাগতিক ও বহির্জাগতিক সংকট উন্মোচনে অ্যাবসার্ডিজমের স্বকীয় প্রয়োগ এসব নাটককে দিয়েছে মৌলিকত্ব। 'আশাহীনতার মধ্যেও জীবনযাপন করার আহ্বান – এই চূড়ান্ত উচ্চারণ ক্যাম্যুর দর্শনের সূত্র ধরে আমাদের দেশের সমকালীন পরিপ্রেক্ষিতে দেখিয়েছেন বাদল সরকার।' (অরূপরতন, ২০০৩ : ১০৮)। স্থানিক-কালিক শৃঙ্খলা ভেঙেচুরে, দর্শক ও মঞ্চের ব্যবধান দূর করে অ্যাবসার্ডিজমের বাতাবরণে নাটকের ভাব ও রূপবিন্যাসে তিনি এনেছেন অভিনবত্ব। অ্যাবসার্ডীয় প্রকৌশলে বিষয়ভাবনা, নির্মাণশৈলী, উপস্থাপনা, ভাষার অনবধানতা, উপযুক্ত প্রতীক-রূপকের ব্যবহার, অভাবনীয় সংলাপ সংযোজন প্রভৃতি প্রসঙ্গে বাদল সরকার বাংলা অ্যাবসার্ড নাট্যধারায় হয়েছেন অনুসরণীয়। তাঁর উত্তরসূরি নাট্যকাররা অ্যাবসার্ডিজমের প্রয়োগ ঘটিয়ে বাংলা অ্যাবসার্ড নাটকের ধারাকে করেছেন সমৃদ্ধ। সর্বোপরি এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, অ্যাবসার্ড তত্ত্বের সংযোজন করে বাদল সরকার বাংলা নাটককে দিয়েছেন এক স্বতন্ত্র মাত্রা।

তথ্যনির্দেশ

১. অ্যাবসার্ড কথাটির প্রচলিত প্রায়োগিক অর্থ উদ্ভট, অবান্তর, অসম্ভব, ভিত্তিহীন প্রভৃতি। অভিধান অনুযায়ী Absurd (অ্যাবসার্ড) শব্দের অর্থ : 1. Inharmonious. 2. Out of harmony with reason or properiety; 3. plainly opposed to reason and hence ridiculous. 4. silly. [The Shorter oxford English Dictionary. Vol. I, 2nd edition. London. Oxford Uniiersity Press, 1936, p. 8]

২. ক. মার্টিন এসলিন *দ্য থিয়েটার অব দ্য অ্যাবসার্ড* গ্রন্থে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী কয়েকজন নাট্যকারের নাটকে অ্যাবসার্ড উপাদান শনাক্ত করেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাট্যকার হলেন আইরিশ স্যামুয়েল বেকেট (১৯০৬-১৯৮৯), রুমানীয় ইউজিন ইয়োনেস্কো (১৯১২-১৯৯৪), রুশ আর্থার আদামভ (১৯০৮–১৯৭০), স্পেনীয় ফার্নান্দো আরাবল (জ. ১৯৩২-) এবং ফরাসি জাঁ জেনে (১৯১০-১৯৮৬)। এ ছাড়াও ইংরেজ নাট্যকার হ্যারল্ড পিন্টার (১৯৩০-২০০৮), আমেরিকান এডোয়ার্ড এলবি (১৯২৮-২০১৬), ফরাসি জাঁ তারদু (১৯০৩–১৯৯৫), বরিস ভিঁরা (১৯২০-১৯৫৯)-সহ অনেক নাট্যকারকে মার্টিন এসলিন অ্যাবসার্ড নাটকের রচয়িতা বা প্রভাবপুষ্ট বলে উল্লেখ করেন।

খ. অ্যাবসার্ড থিয়েটার প্রসঙ্গে মার্টিন এসলিন বলেন, 'The Theatre of the Absurd speaks to a deeper level of the audience's mind. It activates psychological forces, releases and liberates hidden fears and repressed aggressions, and, above all, by confronting the audience with a picture of disintegration, it sets in motion and active process of integrative forces in the mind of each individual spectator. [Martin Esslin, *The theatre of the Absurd*, London : Penguin Book, revised edition, 1968, p. 402]

৩. বাংলা সাহিত্যে সাঈদ আহমদের (১৯৩১-২০১০) *কালবেলা* (১৯৬৩), *মাইলপোস্ট* (১৯৭৬), *তৃষ্ণায়* (১৯৭৬), মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের (১৯৩৪-২০১২) *বাইরের দরজা* (১৯৬৪), *মৃত্যুসংবাদ* (১৯৬৫), *বর্ণ বিপর্যয়* (১৯৬৭), সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র (১৯২২-১৯৭১) *উজানে মৃত্যু* (১৯৬৩) এবং *তরঙ্গভঙ্গ* (১৯৬৪) প্রভৃতি অ্যাবসার্ড নাটকের ধারাকে করেছে সমৃদ্ধ। এ ছাড়াও মুনীর চৌধুরীর (১৯২৫-১৯৭১) *কবর* (১৯৫৩) *দন্ডকারণ্য* ইত্যাদি নাটকেও অ্যাবসার্ডীয় নাট্যরীতির লক্ষণ সুস্পষ্ট। পরবর্তীকালে বাংলাদেশের নাট্যকার সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-২০১৬) এবং সেলিম আল দীনের (১৯৪৯-২০০৮) নাটকে অ্যাবসার্ডীয় বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করা যায়।

৪. *এবং ইন্দ্রজিৎ* নাটকটির রচনাকাল ১৯৬০, প্রথম প্রকাশ বহুরূপী পত্রিকা ২২ সংখ্যা, জুলাই ১৯৬৫, গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ ১৯৬৮ এবং প্রথম মঞ্চায়ন করে শৌভনিক, ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫, মুক্তাঙ্গন, কলকাতা।

৫. The Myth of Sisphus প্রবন্ধের ৪টি অংশ : An Absurd Reasoning, The Absurd Man, Absurd Creation এবং The Myth of Sisphus. এই প্রবন্ধে আলবেয়ার কাম্যু Absurdity'র ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, 'A word that can be explained by reasoning. However faulty is a familiar world. But in a universe that is suddenly deprived of illusions and of light. man feels a stranger. His is an irremediable exile, because he is deprived of memories of a lost homeland as much as he lacks the hope of a promised land to

come. This divorce between man and his life, the actor and his setting, truly constuitutes the feeling of absurdity. [Albert Camus, *The Myth of Sisphus*, Middlesex, Penguin, 1975, p-109]

৬. প্রসঙ্গত জীবনানন্দ দাশের *মহাপৃথিবী* (১৯৪৪) কাব্যের 'আট বছর আগের একদিন' কবিতা স্মরণীয়:

জানি-তবু জানি
নারীর হৃদয়-প্রেম-শিশু-গৃহ-নয় সবখানি;
অর্থ নয়, কীর্তি নয়, স্বচ্ছলতা নয়-
আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে;

৭. আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর *বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস* (১৯৭১ সং, পৃ. ৬৮৪-৮৫) এবং অজিতকুমার ঘোষ তাঁর *বাংলা নাটকের ইতিহাস* (ষষ্ঠ সং, পৃ. ৫৪৯-৫৫২) গ্রন্থে *এবং ইন্দ্রজিৎ* নাটকে অ্যাবসার্ডিটির বৈশিষ্ট্য সনাক্ত করেছেন। আবার, পবিত্র সরকার তাঁর *নাটমঞ্চ নাট্যরূপ* (২০০৮ সং, পৃ. ১৪৮-১৫০) গ্রন্থে *এবং ইন্দ্রজিৎকে* অ্যাবসার্ড নাটক বলে স্বীকার করেননি।

৮. *বাকী ইতিহাস* নাটকটির রচনাকাল ১৯৬৫, প্রথম প্রকাশ বহুরূপী পত্রিকা, গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ নাট্যসংকলন, বাউলমন প্রকাশন, ২০০১ এবং প্রথম মঞ্চায়ন করে বহুরূপী, নিউ এম্পায়ার, ৭ মে ১৯৬৭।

৯. 'পাগলা ঘোড়া' নাটকের রচনাকাল ১৯৬৭, প্রথম অভিনয় ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১, একাডেমি অব ফাইন আর্টস, বহুরূপী।

১০. *সারারাত্তির* নাটকের রচনাকাল ১৯৬৩, প্রথম মঞ্চায়িত হয় ১৪ ডিসেম্বর ১৯৬৯, শতাব্দী, রবীন্দ্রসরোবর মঞ্চ, কলকাতা।

১১.*প্রলাপ* নাটকের রচনাকাল ১৯৬৬, প্রথম প্রকাশ *মহানগর*, শারদীয় সংখ্যা, ১৯৬৮, প্রথম মঞ্চায়িত হয় ২৪ আগস্ট ১৯৬৯, শতাব্দী, প্রতাপ মেমোরিয়াল হল।

১২. *বাঘ* নাটকের রচনাকাল ১৯৬৫, প্রথম মঞ্চায়ন হয় ১৯৬৮, শতাব্দী।

১৩. ইউরোপের দুটি বিশ্বযুদ্ধের ভয়ঙ্কর অভিঘাত, আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার, যন্ত্রসভ্যতার প্রসার, বিজ্ঞানের নিত্যনতুন আবিষ্কার : ডারউইনের বিবর্তনবাদ, মার্কসের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ, ফ্রয়েডের মনোসমীক্ষণ তত্ত্ব প্রভৃতি মানুষের আবহমান বিশ্বাসের জগৎকে করে খণ্ডবিখণ্ড। ঈশ্বরে আস্থাহীনতা, মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, ফ্যাসিবাদের আগ্রাসন ইত্যাদি মানুষের জীবন ও শিল্পের অভিজ্ঞতা ভেঙ্গে দেয়। ন্যায়-অন্যায়বোধ নষ্ট হয়ে যওয়ায় মানুষ অন্বেষণ করে মানবিকতার নতুন সংজ্ঞা। অস্তিত্ব সংকটে নিপতিত হয়ে জীবন ও প্রতিবেশের সংশ্লেষে তৈরি হয়েছে অদ্ভুত বোধের মানুষ।

১৪. *যদি আর একবার* নাটকের রচনাকাল ১৯৬৬, প্রথম মঞ্চায়িত হয় ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬, একাডেমি অব ফাইন আর্টস, বহুরূপী।

১৫. *ত্রিংশ শতাব্দী* নাটকটির রচনাকাল ১৯৬৬, প্রথম অভিনীত হয় ৬ আগস্ট ১৯৭৪, একাডেমি অব ফাইন আর্টস, শতাব্দী।

১৬. *শেষ নেই* নাটকটির রচনাকাল ১৯৭০, প্রথম মঞ্চায়ন ২৪ মে ১৯৭০, প্রতাপ মেমোরিয়াল হল, শতাব্দী।

গ্রন্থপঞ্জি

অরূপরতন ঘোষ (২০০৩)। বাংলা অ্যাবসার্ড থিয়েটার, অন্য শতাব্দী চিত্রকল্প, কলকাতা

আতাউর রহমান (১৯৭৩)। 'অ্যাবসার্ড থিয়েটার', *থিয়েটার পত্রিকা*, ১ম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ত্রৈমাসিক সংকলন, ঢাকা

কবীর চৌধুরী (১৯৮৫)। *এ্যাবসার্ড নাটক*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

কুন্তল মিত্র (২০১১)। *অ্যাবসার্ড নাটক : মাতৃভাষায় বিভাষায়*, অফবিট পাবলিশিং, কলকাতা

জগন্নাথ ঘোষ (২০০৭)। *বাদল সরকারের অ্যাবসার্ড নাট্যচিন্তা : এবং ইন্দ্রজিৎ*, বামা পুস্তকালয়, কলকাতা

তারানা নুপূর (২০১৩)। 'অ্যাবসার্ড নাটক : আণুবীক্ষণিক পর্যবেক্ষণ ও বাংলাদেশ', *বাংলাদেশের হৃদয় হতে* (ছায়ানটের সাহিত্য-সংস্কৃতি ত্রৈমাসিক) [সম্পা. সন্‌জীদা খাতুন], ষষ্ঠ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ঢাকা

দর্শন চৌধুরী (২০০৮)। *নাট্যব্যক্তিত্ব বাদল সরকার*, একুশ শতক, কলকাতা

পবিত্র সরকার (২০০৮)। *নাট্যমঞ্চ নাট্যরূপ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

বাদল সরকার (১৪১৬ ক) *নাটক সমগ্র*, প্রথম খণ্ড, (ভূমিকা : পবিত্র সরকার), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা

বাদল সরকার (১৪১৬ খ)। *নাটক সমগ্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, (ভূমিকা : শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা

বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০১৪)। 'অ্যাবসার্ডবাদ ও সাহিত্যে তার প্রয়োগ', [সম্পা. বেগম আকতার কামাল] *বিশ শতকের প্রতীচ্য সাহিত্য ও সমালোচনা তত্ত্ব*, অবসর, ঢাকা

মেহের নিগার (আষাঢ় ১৪০৫)। 'সাঈদ আহমদের নাটকে অ্যাবসার্ড ধর্ম,' *সাহিত্য পত্রিকা*, [সম্পা. ওয়াকিল আহমদ], ৪১ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সন্ধ্যা দে (১৪১৪)। *অন্য ধারার থিয়েটার : উৎস থেকে উজানে*, দে'জ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা

Camus, Albert (1975). *The Myth of Sisphus*, Middlesex, Penguin, London